আদেশ ও উপদেশ সমূহের (রমিজ বিধানের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা

১। *"সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম,*
বিশ্বমাঝে কর্ম ছাড়া নাহি কোন ধর্ম"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ আত্মকর্মের প্রাধান্য বিষয়ে ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন। আজীবন মানুষকে নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। কর্ম বহুবিধ। কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কর্মই তার জীবন। আর্থিক, দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক একটি না একটি কর্ম তাকে করতেই হয়। ধর্মীয় দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যত ধর্ম আছে প্রত্যেকটি ধর্মেই স্রষ্টাকে পাবার জন্য ধর্ম যাজকগণ নিজ নিজ ধর্মের বহুবিধ কর্ম করার প্রচলন করে গেছেন। কর্ম ছাড়া কোন ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যথা ধর্ম তথা কর্ম। কর্ম বিনে ধর্ম অসার। মানব জীবনে যত ঘটনাই ঘটে তন্মধ্যে কর্মই প্রধান। আধ্যাত্মিক স্তরেও কর্মই সবচেয়ে প্রধান এবং সবচেয়ে বড়। এই উপদেশে ইহাই রমিজের মূল কথা।

রমিজের ভাষায় এখানে ধর্ম হতে কর্ম বড় কিংবা কর্ম হতে ধর্ম বড় একথা বলা হয়নি এবং কর্ম ও ধর্মের কোন পার্থক্য নিয়েও কোন কথা বলা হয়নি। বরং কর্ম ও ধর্ম একটি অপরটির পরিপূরক, তা-ই বলা হয়েছে।

স্বামী পরমহংস দেব বলেছেন **"কর্মই ধর্ম"** তার মানে যার যার কর্মই তার তার ধর্মের পরিচয় বহন করে।

উল্লেখ্য যে, কর্মবাদীদের কর্ম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। গুরু রমিজ যে কোন ধর্ম, মত বা পথের নামে সর্ব প্রকার জীব হত্যা জনিত কর্মের বিরোধী ছিলেন। কারণ বিবেক শাস্ত্র বা মানবতাবাদ অনুযায়ী একটি প্রাণী বা জীবকে হত্যা করে নিজের অথবা অপর প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা যায় না। মানবতাবাদ ও মানব ধর্মকে (Humanism and Human Relegion) রমিজ সর্বোচ্চে স্থান দিতেন।

কারো হাতে বা মুখের বাক্যে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রাণী যেন কষ্ট না পায় এমন কর্ম তিনি অনুশীলন করতেন এবং তাঁর ভক্তদেরকেও তা করতে আদেশ দিতেন।

তিনি অন্য এক আপ্তবাক্যে বলেন-

"যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট,
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব জীবে রাষ্ট্র"

এখানে রমিজ একথাই বলেন যে, যিনি নিজ হাতে বা আদেশে অন্য কোন জীবকে কষ্ট না দিয়ে থাকেন তিনিই আধ্যাত্মিক জগতে একজন যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি। এ জাতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মহোদয়গণ-ই আত্মার মুক্তির পথে সাধন কর্মে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

নিষ্কলুষ ও আদর্শ চরিত্র গঠনকল্পে বিভিন্ন ধর্মের যে সকল সৎ কর্ম অনুশীলন করার উপদেশ দেয়া আছে তৎসমুদয়ের প্রতি রমিজ যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

২। ***"ধর্ম বলি দলাদলি দেখ বিচার করে,***
যত শাস্ত্র তত অস্ত্র দল সাজন করে"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার না করে ধর্মে ধর্মে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতঃ মানবের অকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ছন্দের মাধ্যমে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, শাস্ত্রকারগণ ধর্মের মূল কর্মগুলো মানব কল্যাণের জন্য যুগে যুগে জীবন বিধান হিসেবে প্রয়োগ করে গেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত মানবগণ অর্থাৎ ধর্মের বিপথগামী মানবগণ নিজ স্বার্থ হাসিল করার নিমিত্তে শাস্ত্রগুলোকে মানব কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের পথে ব্যবহার করে আসছেন।

শাস্ত্রগুলোকে অপব্যবহার করে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের পরিবর্তে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে, সহজ-সরল প্রাণ মানুষকে বিপথগামী করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে

গোষ্ঠীতে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে দলাদলি সৃষ্টি করতঃ মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, গোলাবাজি, বোমাবাজি এবং আত্মঘাতী বোমা মারার মতো জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজে কোন কোন লোক লিপ্ত রয়েছে।

নিজ নিজ ধর্মীয় শাস্ত্রের প্রতি মানুষের একটি অন্ধ বিশ্বাস থাকে। এ বিশ্বাসকে পূঁজি করে একটি বিশেষ মহল সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করে আসছে আর আজও এ প্রবনতা উক্ত মহলগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষ তাদের শাস্ত্রগুলো বিকৃতি করে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ধর্ম ও শাস্ত্রের সুফল পাচ্ছে না। অর্থাৎ বহুদিন যাবৎ ধর্মীয় শাস্ত্রগুলোকে রাজনীতির দলীয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

৩। *"একেক দলের একেক শাস্ত্র, এই হল তার দলের অস্ত্র, দলাদলি তার মহামন্ত্র, কর্ম, ধর্ম, তন্ত্র"*

ব্যাখ্যা: প্রত্যেকটি ধর্মের মূল নীতি-নিয়মকে শাস্ত্র বলা হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি ধর্ম আবির্ভাবের অনেক পর ধর্মের শাস্ত্রকে সঠিক পথে ব্যবহার না করে সমকালীন শাস্ত্রকারগণ মনগড়া শাস্ত্র প্রণয়ন করতঃ তাদের এবং সমাজের সমাজপতিদের স্বার্থে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো।

ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ভেদাভেদ সৃষ্টি করতঃ ধর্মের মনগড়া শাস্ত্রগুলোকে দলাদলি নামক মহামন্ত্রে বিলীন করে দিয়েছে। অর্থাৎ এক ধর্ম অন্য আরেক ধর্মের একে অপরের কর্ম নিয়ে দলাদলি, ধর্ম নিয়ে দলাদলি এবং তন্ত্র (সাধন প্রণালী) নিয়েও দলাদলিতে ব্যস্ত হয়ে পরেছে।

অর্থাৎ-কর্ম, ধর্ম এবং তন্ত্র (সাধন প্রণালী) কে মনগড়া শাস্ত্রের মাধ্যমে দলাদলি নামক মহামন্ত্রে পরিণত করেছে। যার ফলে পৃথিবীর মানব জাতিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে কলহ, নষ্ট হচ্ছে মানুষে মানুষে প্রেম, ভালবাসা ও সাম্যতা।

চিরতরে বিদায় নিতে চলছে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মমতা। আর এভাবে দিন দিন কেবল বেড়েই চলছে বিভেদের প্রাচীর।

৪। *"সবচেয়ে বড় শত্রু মন আপনার,*
বাধা দিতে শক্তি নাহি জগতে কাহার"

ব্যাখ্যা: মানব দেহে অবস্থিত মন একটি বড় শক্তি। মন মানুষের সকল স্মৃতি বহন করে। মানব দেহের জ্ঞান-মন দ্বারাই সকল কর্ম সম্পাদন করায়। কোন কিছুর প্রভাবে মানবের জ্ঞান বিকৃত হলে মনও বিকৃত হয়ে যায়। এ অবস্থায় মন দ্বারা মানুষ যা ইচ্ছা তাই করে। মনের দুটি গতি থাকে। একটি 'সু'মতি অপরটি 'কু'মতি। কুপ্রবৃত্তি দ্বারা মন যখন নিয়ন্ত্রিত হয় তখন মন দ্বারা শুধু কুকর্মই সংঘটিত হয়। যখন মন এরূপ ধারণ করে তখন কোন শক্তিই তাকে বারণ করতে পারে না। মন খারাপ হলে মানুষ অনেক খারাপ কাজই করতে পারে। তখন কারো বাধাই সে মানে না।

এখানে গুরু রমিজ তা-ই বলছেন যে, মনই জগতে জ্ঞান এবং বিবেকের (আমিত্ব) সবচেয়ে বড় শত্রু। এ অবস্থায় মনকে প্রতিরোধ করার আর কোন শক্তিই থাকে না।

(প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একজন সদ্‌গুরুই পারেন একজনের মনকে বাধ্য করাতে। তবে ইহাতে সাধন চর্চার কোন বিকল্প নেই।

৫। *"প্রকৃত বন্ধু জীবের যে পেয়েছে জ্ঞান,*
বিপদে-সম্পদে যিনি রক্ষা করেন প্রাণ"

ব্যাখ্যা: উক্ত উপদেশ বাক্যে গুরু রমিজ বলেন যে, তিনিই জীবের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু যিনি বিপদে-সম্পদে সর্বজীবের প্রাণ রক্ষা করেন এবং জীবের প্রাণ রক্ষা করার সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছেন।

যিনি নিজের আত্মা এবং সর্বজীবের আত্মা একই প্রকার আত্মা (পরমাত্মা) হিসেবে পরিচয় পেয়েছেন তিনিই আত্মতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছেন এবং সর্বজীবের আত্মাকে নিজ আত্মার মত মর্যাদা দিয়ে

তাদেরকে বিপদে-সম্পদে রক্ষা করতে পারেন। সকল আত্মা এক এবং অভিন্ন, কেবলমাত্র বিভিন্ন কর্মের কারণে কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ ধারণ করতঃ বিভিন্ন জীবের আকার প্রাপ্ত হয়। কর্ম অনুযায়ী যে যেরকম দেহ প্রাপ্য হয় সে সেরকম দেহেই জন্ম লাভ করে।

দেহ প্রাপ্তির বিষয়টি মন শত্রু দ্বারা কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে।

৬। ***"জ্ঞান দ্বারা মন শত্রুর যে না করে বিচার,***
তার মত বোকা ভবে কেবা আছে আর"

ব্যাখ্যাঃ দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা ও জ্ঞান সমাহারে মানব দেহের উদ্ভব। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের মতবাদ অনুসারে মানবাত্মার ভবিষ্যৎ দেহ গঠন তার বর্তমান কর্মের উপর নির্ভরশীল।

গুরু রমিজের দর্শন অনুযায়ী আত্মা প্রকৃত জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা এমন সৎকর্মও করতে পারে যাতে তার পরজন্মে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আর আসতে না হয়। অর্থাৎ জন্ম লাভ করতে না হয়।

উক্ত আত্মাই নির্বাণ বা মুক্তি প্রাপ্ত আত্মা। অর্থাৎ আত্মার জীবনচক্র হতে মুক্তি লাভ করে নির্বাণ হয়েছে।

তাই, রমিজের মতাদর্শ মতে জ্ঞান দ্বারা মন শত্রুকে বিচার করে কু-প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে সৎকর্ম করাই শ্রেয়। যারা জ্ঞান দ্বারা বিচার না করে অসৎ কর্মে লিপ্ত, তাদেরকে রমিজ আত্মরাজ্যের বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৭। ***"প্রকৃত জ্ঞান যিনি পেয়েছেন ভূমন্ডলে,***
তিনিই জীবন মুক্তি জানিও সকলে"

ব্যাখ্যাঃ এখানে গুরু রমিজ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার সুফলের কথা ব্যক্ত করেছেন। একজন মহাজ্ঞানীর সঙ্গ লাভ করতে পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আর সে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটিই-বা কে ? অবশ্যই তিনি হচ্ছেন একজন সদ্‌গুরু বা নিষ্ঠাগুরু এবং চেতন গুরু।

রমিজের মতে, সদ্‌গুরু হতে প্রাপ্ত জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা হয় কিংবা সদ্‌গুরু হতে প্রাপ্ত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বুঝায়।

যিনি ভূমন্ডলে উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনিই জীবন মুক্তি লাভ করেছেন। তিনিই জীবনচক্র হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। তাকে আর পুনরায় জন্ম নিতে হবে না। তাঁর পরমাত্মা স্রষ্টার পরমাত্মার সাথে অনন্তে লয় হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় উক্ত আত্মা-আত্মার রাজ্যে (আলমে আরওয়ায়) সম্মানজনক স্থান পাবেন।

৮। ***"কর্ম ছাড়া ধর্ম কি জগতে দেখিনা,***
ধর্ম সব দলাদলি আসলে আত্মার কামনা"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ বলেন যে, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তত ধরণের কর্মও রয়েছে। প্রত্যেকটি ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মাচার ও কর্ম আছে। কর্ম ছাড়া ধর্ম হতে পারে না।

শাস্ত্রকারগণ ধর্ম-কর্মগুলোকে ধর্ম আবির্ভাবের বহু পরে মানুষের কাছে তাদের মনগড়াভাবে এমন করে প্রকাশ করেছেন এবং উপস্থাপনা করেছেন যাতে ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে, মতে মতে দলাদলির প্রকাশ ঘটে।

একেকটি ধর্ম ও মত যেন একেকটি দল। এক ধর্মে যেটি আদেশ করা হয়েছে অন্য ধর্মে সেটি নিষেধ করা হয়েছে। আবার এমন মতও রয়েছে যেখানে আদেশ-নিষেধ বলতে কিছুই নেই। যখন যা ইচ্ছা তা-ই তারা করে থাকে। সবই তাদের আত্মার কামনা বা ইচ্ছা। এখানে আত্মা মনের কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছাধীন এবং জ্ঞান কুকর্মের বিকারগ্রস্থ অবস্থায় থাকে।

৯। *"মানবকে ভালবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি,*
মানবেতে আছেন প্রভু তাঁরে জানাও স্তুতি"

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যে গুরু রমিজ মানবকে অতি উচ্চে এবং অতি মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ও মানুষকে সেই স্থান দিয়েছেন। সকল মানবই আদম সন্তান এবং আশরাফুল মাখ্লুকাত।

স্রষ্টা আদি মানব আদমকে সৃষ্টি করেই তাঁকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ করলেন। একজন ব্যতীত সকল ফেরেশতাই আদমকে সেজদায় অবনত হল। স্বয়ং স্রষ্টা আদম সন্তানের কাল্বে বা হৃদয়ে অবস্থান করেন।

সুতরাং দেহধারী মানবের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা রেখে তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত স্রষ্টাকে স্তুতি বা আরাধনা করার জন্য গুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে আদেশ দিয়েছেন।

১০। *"মস্জিদে মন্দিরে নাই আছে ঘরে ঘরে,*
বানাইয়া আপনার ঘর-আছে তাঁর ভিতরে"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ স্রষ্টার অবস্থান কোথায় এবং তিনি কি অবস্থায় থাকেন তাঁর একটি আভাস দিয়েছেন।

রমিজের মূল বক্তব্য হলো যে, মানবের গড়া মস্জিদ বা মন্দিরে স্রষ্টা বসবাস করেন না। তবে স্রষ্টার গড়া মানবের "হৃদয়" নামক কাবাঘরে তাঁর অবস্থান। তেমনিভাবে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেও তিনি (স্রষ্টা) বিরাজিত।

মানবের (প্রাণীসহ) দেহ ও হৃদয় স্রষ্টার নিজ ইচ্ছায় এবং পছন্দ মতে গড়া। তাঁর নিজ ইচ্ছা এবং পছন্দমতে গড়া হৃদয় কাবায়-ই তিনি অবস্থান করেন। *সনাতন ধর্মের শাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করেছেন-*

"যথা জীব তথা শিব" ও "নররূপে নারায়ণ"

ইসলাম ধর্ম মতে হাদীসে উল্লেখ আছে যে *"ইন্না কুলুবিল আরশিল্লে মোমেনা"*। অর্থাৎ মানবের হৃদয়েই স্রষ্টার আসন তিনি আলাদা কোন স্থানে ঘর বাড়ি তৈরী করতঃ সেখানে বসবাস করেন না। সুতরাং, প্রত্যেক মানব এবং প্রাণীই স্রষ্টার আবাসস্থান। যেহেতু মানব সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ট *(আশরাফুল মাখ্‌লুকাত)* সেহেতু মানবাকারেই তিনি যুগে যুগে স্থানে স্থানে মানবের আত্মাকে মুক্তি করার জন্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

১১। *"মানবরূপে কখন তারে না করিও জ্ঞান,*
মহা পাপের ধরাতলে পাবেনা পরিত্রাণ"

ব্যাখ্যা: গুরু রমিজ এখানে বলেন যে, স্রষ্টা যুগে যুগে বা বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে স্থানে মানবের আত্মাকে মুক্তি করার জন্য এবং তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে পৃথিবীতে মানবাকারে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা হিসেবে আবির্ভূত হন। আবার সদ্‌গুরুও পরমাত্মার অধিকারী হয়ে ফানাফিল্লা ও বাকাবিল্লার পর্যায়ভুক্ত হয়ে স্রষ্টার জাতের সাথে বিলীন হয়ে মিশে থাকেন।

ইসলাম মতে যারা সূফীবাদে বিশ্বাসী তারা তাদের কথা অনুযায়ী পরমের সাথে বিলীন হয়ে যাবার জন্য আরাধনা ও সৎকর্মে রত থাকেন এবং নিস্কলুষ চরিত্র গঠন করতঃ আমি সত্য *(আন্ আলহক)* বা আমি হক বলে দাবী করার প্রয়াস পান।

সনাতন ধর্ম মতে এ পর্যায়ের লোকগণ বা মণি, ঋষি, যোগী বলেন যে *"অহংব্রোম্মি" অর্থাৎ "আমি সেই পরম ব্রহ্ম"*। এভাবে যারা পরম স্রষ্টার জাতের সাথে মিলিত অবস্থায় মিশে গেছেন, তাদেরকে আর মানবরূপে জ্ঞান না করার জন্য রমিজ তাঁর ভক্তগণকে আদেশ ও উপদেশ দিয়েছেন।

মহাগুরু রমিজ পন্থীরা এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অকুণ্ঠচিত্তে পালন করা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, স্রষ্টা এবং পরম সদ্‌গুরুকে কোন সময়ই মানবরূপে কল্পনা করা যাবে না। তাও বলা হয়েছে যে, যদি কেহ স্রষ্টা এবং সদ্‌গুরুকে সাধারণ মানবরূপে কল্পনা করে তবে সে মহাপাপী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উক্ত মহাপাপী ব্যক্তি এ ধরাতলে কোন দিনও পরিত্রাণ পাবে না অর্থাৎ আত্মার মুক্তি পাবে না।

১২। *"ইচ্ছা করি গুরুর বাক্য যে করিবে রদ,*
হইবে সে মহাপাপী পাবেনা কোন পথ।"

ব্যাখ্যাঃ এ সিদ্ধবাক্যে গুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, কেহ যদি ইচ্ছা করে এবং জেনে শুনে গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করে তবে সে মহাপাপীর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং কোন সময়ও সে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। কারণ, পূর্ববর্তী সিদ্ধবাক্যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যিনি সদ্‌গুরু তিনি স্রষ্টাতে বিলীন অবস্থায় আছেন। অর্থাৎ তিনি স্রষ্টার জাত পাকের সাথে মিশে আছেন। তাই সদ্‌গুরুও জাতে হক। তা হলে ইচ্ছা করে গুরু বাক্য বা আদেশ লঙ্ঘন করলে স্রষ্টার বাক্যই লঙ্ঘন করা হলো।

স্রষ্টার আদেশ লঙ্ঘন করলে বিধান মতে মহাপাপী হতে হয়। সুতরাং, গুরু বাক্য লঙ্ঘন করলেও মহাপাপী হতে হবে।

১৩। *"অপরের দোষ চর্চা করে যেইজন,*
হবেনা তার আত্মার মুক্তি সত্য এই বচন"

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত আপ্তবাক্যটি আত্মতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করছে। গুরু রমিজের নীতির প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান। তাঁর মানে তিনি সর্বত্র, সর্বক্ষণ, সর্বজীবে মিশে আছেন। তা হলে সর্বজীব শ্রেষ্ঠ মানবের ক্বাল্‌বে বা হৃদয়ে তিনি বাস করছেন। তাই কোন মানুষের দোষ চর্চা করা মানে স্রষ্টারই দোষ চর্চা

করা হলো। আর স্রষ্টার দোষ চর্চা করলে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা সুদূর পরাহত।

রমিজ তাঁর এক বাণীতে বলেন-

"রমিজ কয় চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি,
আত্মজ্ঞানে জ্বালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা"
... তুমি কর্মে বাধা জগৎ জোড়া।

বাণী নং-৭ (অলৌকিক সুধা)

মানব সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ জীব। সুতরাং যেহেতু মানবের হৃদয়ে স্রষ্টার বাসস্থান, সেহেতু মানুষের দোষ চর্চা করা মানেই স্রষ্টার দোষ চর্চা করার শামিল। সেজন্য রমিজ তাঁর ভক্তগণকে মানুষের দোষ চর্চা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ, সর্বজীব এবং মানুষকে ভালবাসলেই এবং মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিলেই কেবলমাত্র মুক্তি লাভ করা সম্ভব। উপরোক্ত রমিজের বাণীর ভাষায় তা-ই বলা হয়েছে।

১৪। *"আপনার দোষ যেবা ভাবে সব সময়,*
সে হইল মহাজ্ঞানী জানিও নিশ্চয়"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ ভক্তদেরকে নিজের দোষ নিজে অকপটে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। নিজের দোষ নিজে স্বীকার করলে হৃদয়ে অনুতাপ সৃষ্টি হয়। সে অনুতাপ হতে পাপ লাঘবের জন্য চোখে অশ্রু নির্গত হয়। সে অশ্রুতে বা চোখের জলে পাপ জ্বালিয়ে দেয়া যায়।

কোন এক মণিষী বলেছেন- ***"পাপ করে অনুতাপ করে যেইজন,***
সাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে মহাজন"

এখানে ইহাই সুস্পট হলো যে, নিজের ভুল (দোষ) স্বীকার করতঃ চোখের জলে অনুতাপ প্রকাশ করলে ইহা সাধনা হতেও শ্রেষ্ট। আর তা

হলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভুলের জন্য বা পাপের জন্য পাপ স্বীকার করতঃ চোখের জলে অনুতাপ প্রকাশ করা একটি মহা সাধনা।

মানুষ স্রষ্টাকে পাবার জন্য বহুরূপী সাধনায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। স্রষ্টা এবং গুরুর নিকট যাবতীয় দোষ বা পাপ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতঃ অনুশোচনায় লিপ্ত হলে স্রষ্টা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

তাই গুরু রমিজ বলেন– ***"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্যস্নান করে,***
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রাসীতে না পারে"

উপদেশ-৫ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানেও গুরু রমিজের মূল বক্তব্য হলো-একবার ভুল করে বহুবার অনুশোচনা করলে অর্থাৎ ভুল বা পাপের জন্য বহুবার অথবা বার বার চোখের জলে অনুতাপ প্রকাশ করলে অনুতাপকারীকে কোন প্রকার পাপেই গ্রাস করতে পারে না।

যিনি নিজের ভুল বা পাপ নিজেই স্বীকার করতঃ অনুশোচনায় লিপ্ত থাকেন তিনি অবশ্যই একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। কারণ জ্ঞানীরা আত্ম সমালোচনা পূর্বক ভুল স্বীকার করতে পারেন কিন্তু অজ্ঞানীরা কখনও আত্মসমালোচনা করে না এবং নিজের ভুলও স্বীকার করে না।

রমিজের আরেকটা বাণীতে দোষ বা নিজ নিজ পাপ স্বীকার করার জন্য তাঁর ভাষায় বলেন-

"রমিজ বলে সুখ নাই আর, পুড়ে হবি ছাড়খার,
স্বীকার কর দোষ যার যার, নইলে উপায় নাই"

বাণী নং-৪০ (স্বর্গের সুধা)

সুতরাং, স্রষ্টা বা গুরুর নিকট বিভিন্নভাবে নিজের ভুল বা দোষ স্বীকার করতঃ যদি পাপমুক্ত হওয়া যায় তবে ভক্তের আত্মা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন।

আবার নিষ্কলুষ আত্মার অধিকারী ভক্ত সদ্‌গুরুর মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট আমিত্বকে বিসর্জন করে স্রষ্টার জাতের সাথে মিশে অনন্তে বিলীন হয়ে যান।

এ অবস্থায় রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন যে-

"তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে
অনর্গল চোখের ধারা আপনি বহিবে।
হইবে তোমার মধ্যে সত্যের পরিচয়
যথায় তুমি তথায় আমি জানিও নিশ্চয়"

উপদেশ-১৩,১৪ (অলৌকিক সুধা)

যিনি স্রষ্টার জাতের সাথে মিশে যান তিনিই মহাজ্ঞানী মহাজন।

১৫। *"যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট,*
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্বজীবে রাষ্ট্র"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে গুরু রমিজ, আধ্যাত্মিকভাবে জ্ঞানী কে ? তাঁর কথাই বলেছেন। অধ্যাত্ম জগতে সর্বজীবের আত্মার সথে অনন্তরূপে স্রষ্টা মিশে আছেন। অর্থাৎ সর্বজীবের আত্মাসমূহ স্রষ্টার পরমাত্মা হতেই সৃষ্টি হয়েছে। কর্মফেরে বিভিন্ন জীবে আত্মা সমূহের বাসস্থান।

সুতরাং জীবকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হয়। আবার এখানে জীবকে কিভাবে ভালবাসতে হবে তা-ও বলা হয়েছে। যেমন-নিজের হাত দ্বারা যেন কোন জীবকে কষ্ট না দেওয়া হয়, নিজের কথা বা বাক্য দ্বারা যেন কোন মানব অথবা জীব কষ্ট না পায়, মুখের আদেশ বা বাক্য দ্বারাও যেন কোন লোক বা প্রাণী কষ্ট না পায়। তা হলে, যিনি নিজের জ্ঞানকে এমন সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যেন কোন প্রকারেই কোন জীবের কষ্টের কারণ না হয় এবং জীবের প্রাণকে নিজের প্রাণের মত মনে করেন, কেবল তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। সনাতন ধর্ম মতে আছে-

"যথা জীব তথা শিব ও নররূপে নারায়ণ"

অর্থাৎ, মানব বা জীব মাত্রই ভগবান।

ইসলাম মতে হাদীসে আছে *"ইন্নাকুলুবিল আরশিল্লে মোমেনা"* অর্থাৎ মোমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র বাসস্থান। মোমিন বলতে নিষ্পাপ মানুষকে বুঝায়। অর্থাৎ যিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী তিনিই মোমিন ব্যক্তি। তা হলে, কোন মানব এবং প্রাণীকে কোন প্রকারে কষ্ট বা আঘাত দিলে তা স্রষ্টাকেই দেয়া হলো। তাই, কোন প্রাণীকেই কষ্ট বা আঘাত দেয়া উচিৎ নয়।

১৬। *"প্রতি জীবে আছেন প্রভু কর্মফল সত্য*
একেক কর্মের একেক ফল রূপ তার অনন্ত"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে গুরু রমিজ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, প্রতিজীবে বা সর্বজীবে স্রষ্টা বিরাজিত। তাঁর মতে (দর্শনে) পূর্বজন্মে যে যেই স্বভাবের কর্ম করেছে সে সেই স্বভাব অনুযায়ী বর্তমান জন্মে চেহারা এবং রূপ ধারণ করেছে।

আবার অনেকে মানবাকারে ধরায় জন্ম নিয়ে শৃগাল, কুকুর, গরু ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর ন্যায় কর্ম করতঃ মানুষের ক্ষতি সাধন করে, আবার বিষধর সাপে কামড়ালে যেমন মানুষ ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তদ্রুপ এমন স্বভাবের লোকও রয়েছে যারা অন্য মানুষের সমূহ ক্ষতি করার এমন ফাঁদ পাতে যেন তারা তিলে তিলে হৃদয় ও মনের যন্ত্রণায় প্রাণ যায়।

বর্তমান জমানায় ইতর প্রাণীর স্বভাব সুলভ মানুষের কোন অভাব নেই। সুতরাং, জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী তারা ইতর প্রাণীর দেহ নিয়ে পুনরায় জন্ম ধারণ করবে এবং ইহাই স্বাভাবিক ও যুক্তি সংগত।

মানবগণ অনন্তরূপ কর্মে ব্যস্ত থাকে। কর্ম অনুযায়ী পৃথিবীতে পুনরায় অনন্ত কর্মের অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়ে অনন্ত রূপ ধারণ করতঃ সর্বজীবে জন্ম নিয়ে থাকে।